ভাষাতত্ত্ব (টীকা)

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

ভাষা

ভাষার সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। এদের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট বলেছেন–
–

"A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact."

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

''মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিস্পন্ন, কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথ্য বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিই ভাষা।''

আবার ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

''মানুষের বাক্‌যন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।''

অর্থাৎ ভাষা বলতে বোঝা যায় যে, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত কোন জনসমাজে ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টি যার দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলে। সুতরাং ভাষার বৈশিষ্টগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় ইহা মানুষের বাগ্‌যন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত হবে, বহুজনবোধ্য হবে, অনেক মানুষ এর দ্বারা মনের ভাব আদান প্রদান করবে।

উপভাষা

ভাষার মাধ্যমে একটি বিশেষ জনসমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। যে জনসমাজের লোকেরা একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টি দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে তাকে বলে ভাষা সম্প্রদায়। কোন ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষারূপকে উপভাষা বলে। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

''কোন ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষার ছাঁদকে উপভাষা বলে।''

কোন ভাষাসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প হলে সে ভাষায় কোন উপভাষার সৃষ্টি হয়না, কেননা সকলের সঙ্গে সকলের ভাষা ব্যবহারের সুযোগ থাকে। কিন্তু ভাষা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে অনিবার্য কারনেই উপভাষার উদ্ভব হয়। কারন ভাষা সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত হলে সকলের সঙ্গে সকলের মেশার ও কথা বলার সুযোগ থাকেনা। মানুষ স্বভাবিকভাবেই ছোট ছোট দল বা পৃথক পৃথক অঞ্চলে গন্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। এরফলে সেই দল বা অঞ্চলের প্রভাব মুখের ভাষার উপরেও পড়ে এবং মুখের ভাষা মূল ভাষা থেকে একটু পৃথক হয়ে যায়।

যেমন বাংলা ভাষা সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি খুব বেশি। স্বাভাবিকভাবেই এই ভাষাগোষ্ঠীর সমস্তলোকের মুখের ভাষা এক রকম থাকেনি। ফলে নানা বাংলা উপভাষার জন্ম হয়েছে। যেমন— বঙ্গালী, কামরূপী, বরেন্দ্রী, রাঢ়ী এবং ঝাড়খন্ডী।

নিভাষা বা বিভাষা

ড. সুকুমার সেন 'নিজভাষা' এই শব্দটি থেকে নিভাষা শব্দটি তৈরি করেছেন। নিভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

''অনেক সময় কোন ব্যক্তি বিশেষের (অথবা পরিবার বিশেষের) বাগ্‌ব্যবহারে ধ্বনি শব্দ অথবা শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে অল্পস্বল্প স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। এমন ব্যক্তিনিষ্ঠ উপভাষাকে বলতে পারি নিভাষা (Idiolect)।''

নিভাষার আর এক নাম বিভাষা। 'বিশেষ ভাষা' থেকে বিভাষা পরিভাষাটি গঠিত হয়েছে।

আসলে ভাষা মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া। মানুষের মধ্যে তা এতই প্রচলিত যে একে একটি সক্রিয় বৃত্ত মনে হয়। ভাষা মানুষের চিন্তা ভাবনার ফসল। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হলেও ভিন্ন সমাজ গোষ্ঠীতে যারা বাস করে তাদের ভাষাও ভিন্ন হয়। এ থেকেই নিভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

যেমন— রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিতে 'ল'-এর উচ্চারণ এবং প্রথম যুগের শান্তিনিকেতন বাসীদের 'শ'-এর উচ্চারণে নিভাষার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও সংবাদ পাঠক কিংবা দুরদর্শনের ঘোষক-ঘোষিকার বাগ্‌ভঙ্গীতেও নিভাষার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

কৃত্রিম ভাষা

প্রচলিত ভাষাগুলির বাইরে মনগড়া শব্দ ও পদ দিয়ে তৈরি ভাষাকে বলা হয় কৃত্রিম ভাষা। কৃত্রিম ভাষা দুই রকম—

১)কোন নির্দিষ্ট দলের মধ্যে ব্যবহৃত গোপন ভাষা এবং

২)সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ভাষা।

প্রথম প্রকারের কৃত্রিম ভাষা সংকেত ভাষার মধ্যে পড়ে। ছোট ছেলেদের সংকেত ভাষা— পদের ধ্বনি বিপর্যয় করে অথবা পদের আদিতে বিশেষ ধ্বনি যোগ করে অন্যের সামনে অথচ তাদের অগোচরে বার্তা বিনিময় করে— এর উদাহরন।

ইউরোপে শিক্ষিত লোকের সর্বজনীন ভাষা সম্ভাবনার প্রথম ঈঙ্গিত দিয়েছিলেন বিখ্যাত মনীষি দেকার্ত ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে। এরপর অনেকে চেষ্টা করলেও তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা ছিল জার্মান ভাষী পাদরী শ্লেয়ের আবিস্কৃত ভোলাপ্যুক (Volapuk)। এ ভাষার শব্দ প্রধানত ইংরেজি ও ল্যাটিন জাত এবং জার্মান ভাষার ব্যকরণ অনুকরনে গঠিত।

ভোলাপ্যুক আবিস্কারের দশ বছর পর পোল্যান্ডের অধিবাসী ড. জামেনহফ উন্নততর সর্বজনীন ইউরোপীয় ভাষা গঠন করেন। তিনি এ ভাষার নাম দেন এসপারেন্টো (Esparento)। এ ভাষার গঠন খুব সহজ। শব্দভান্ডারের মূলধন গ্রীক ও ল্যাটিন, ব্যকরণ জার্মান ভাষা থেকে গৃহীত। যেমন—

"La intelgenta persono lernas la interlingvon Esperento rapide kaj facile."—এটি এসপারেনটোর উদাহরন। এর ইংরেজি অনুবাদ— The inteligent person learns the inter-language Esparento rapidly and easily. শব্দগুলি ইংরেজি ও ফরাসি জানা ব্যক্তি সহজেই চিনতে পারেন। কেবল kaj শব্দটি গ্রীক (kai)।

চলিত ভাষা

বাংলা ভাষায় পাঁচটি উপভাষা আছে। এর মধ্যে রাঢ়ী অর্থাৎ কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এক আদর্শ বাংলা ভাষা। একেই বলা হয় আদর্শ চলিত বাংলা। ড. সুকুমার সেন চলিত বাংলার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

''আধুনিক সময়ে শিক্ষিত সমাজে বাঙালা কথ্য ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহাকে চলিত ভাষা (Standart Collonqual) বলা হয়।''

আগেকার দিনে লেখার ভাষাকে সাধুভাষা এবং কথ্য ভাষাকে চলিত ভাষা বলা হত। কিন্তু ধীরে ধীরে সাহিত্যিকরা কথ্য ভাষাতেও সাহিত্য লিখতে শুরু করেন এবং বর্তমানে চলিত ভাষা বাংলা ভাষায় লেখ্যরূপ পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসেই প্রথম চলিত ভাষার প্রকাশ ঘটে। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমথ চৌধুরীর হাত ধরে বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে চলিত

ভাষার প্রসার ঘটতে শুরু করে। বর্তমানে চলিত ভাষা ভদ্রসমাজে, গল্পে-উপন্যাসে, চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রগুলি চলিত ভাষাতেই লেখা হচ্ছে।

চলিত ভাষার শব্দরূপে, ক্রিয়ারূপে, বাক্যগঠনে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা গৃহীত হয়নি। চলিত ভাষায় সাধুভাষার ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের সংকোচিত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। চলিত ভাষা একালের মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষা। এই ভাষা এখন যেমন সাহিত্যের ভাষা, তেমনি শিক্ষিতজনের ভাব বিনিময়ের মার্জিত মাধ্যম।

অপভাষা

এক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ যদি ভালো করে না শিখে অপর ভাষা ব্যবহার করে তবে তাদের উচ্চারণে ও শব্দপ্রয়োগে বিকৃতি ও ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় এই বিকৃত ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বাগ্‌ব্যবহারকে অপভাষা বলে। অতীত ভারতবর্ষে আগত বিদেশীদের কাছে সংস্কৃত ভাষা সহজ ছিলনা। এইজন্য তাদের ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অবোধ্য বাগ্‌ব্যবহারকারী রূপে আখ্যায়িত করা হত। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

''উচ্চারণের দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতবাসী আমরা ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে অপভাষী অর্থাৎ ম্লেচ্ছ।''

প্রকৃতপক্ষে সব মানুষের পক্ষে অন্যভাষাকে ঠিকমত রপ্ত করে সেই ভাষাভাষী মানুষের মত সুন্দর করে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। কারন বেশিরভাগ মানুষ নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষাতে কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। যার ফলে মানুষ হয়ে ওঠে অপভাষী। এ কারনে ইংরেজ বা অন্য ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা যখন আমাদের বাংলা ভাষা উচ্চারণ করে তখন তা আমাদের কানে বিসদৃশ মনে হয়। এভাবেই অপভাষার সৃষ্টি হয়।

বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নীলদর্পণ নাটকে অপভাষার প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। এই নাটকে এক ইংরেজ সাহেব বলেন—

''তুমি বড় নালায়ক হইয়াছে।''

অনেক ভাষাতাত্বিক মনে করে অপভাষা ও মিশ্রভাষা অর্থাৎ Mixed Language একই প্রকৃতির।

স্বনিম

ইংরেজিতে 'Sound' এবং বাংলায় 'ধ্বনি' শব্দদুটি ব্যপক অর্থ বহন করে। যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনি, হাততালির ধ্বনি, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি প্রভৃতি সবরকমের ধ্বনিকে আমরা Sound বা ধ্বনি বলে থাকি। এত রকমের ধ্বনির মধ্যে শুধু মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিকে বলে স্বন বা বাগ্‌ধ্বনি। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহেয্যে উচ্চারিত সব ধ্বনিই আবার বাক্যে ব্যবহৃত হয় না। যেমন— পাগলের অর্থহীন প্রলাপ বা শিশুর অস্ফুট ধ্বনি। ভাষায় প্রত্যেকটি উচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে একটি করে স্বতন্ত্র রূপ থাকে। এদের মধ্যে কিছু ধ্বনি হল মূল ধ্বনি, আর কিছু হল মূল ধ্বনির উচ্চরণ বৈচিত্র্য। যেমন— শ্লীল শব্দের 'শ'-এর উচ্চারণ 'স'(s)-এর মত। কিন্তু শীল শব্দের 'শ'-এর উচ্চারণ 'শ'-ই। মূলধ্বনি একটাই-শ। কিন্তু বাংলায় তার দু'টি উচ্চারণ বৈচিত্র্য। কখনো 'স'-এর মত আবার কখনো 'শ'-ই।

ভাষার কিছু মূলধ্বনি থাকে এবং তাদের মধ্যে কোন কোনটির একাধিক উচ্চারণ বৈচিত্র থাকে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চরণ বৈচিত্র্যসহ প্রত্যেকটি মূলধ্বনিকে বলে স্বনিম।

ড. সুণীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৬টি স্বরধ্বনিকে স্বনিমরূপে স্বীকার করেছেন এবং ১৯টি ব্যঞ্জনকে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া ১০টি মহাপ্রাণ, স্পৃষ্ট ও ঘৃষ্টধ্বনিও স্বনিমরূপে বিবেচেত হয়। যদিও এগুলি একক স্বরধ্বনি নয়, যৌগিক ধ্বনি।

স্বরধ্বনি

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় স্বরধ্বনির সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন—

''যে ধ্বনি অন্যধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিস্ফুটভাবে উচ্চাড়িত হয় এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাহাকে স্বরধ্বনি (vowel sound) বলে। যেমন— অ, অ্যা, এ, ও।''

এই সংজ্ঞাটিকে স্বীকার করে নিয়ে পরবর্তীকালে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে স্বরধ্বনির সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের কথা থেকে এ সংজ্ঞাটি উঠে আসে যে, যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরের কোন অংশে কোনরূপ বাঁধা পায়না তাকে স্বরধ্বনি বলে। ড. সুকুমার সেন ই, এ, এ', অ, আ', অ*,ও, উ (i, e, E, a, a, a', o, u)—এই আটটিকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলেছেন। তবে এগুলি বিশেষ কোন ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি নয়। এগুলি সব ভাষায় স্বরধ্বনি চিনবার মান বা নিদর্শন।

স্বরধ্বনিকে নানাভাবে ভাগ করা হয়। যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সম্মুখদিকে প্রসারিত হয় তাকে সম্মুখ স্বরধ্বনি, আর যে ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা পশ্চাৎদিকে অপসারিত হয় তাকে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে। আবার ওষ্ঠ্য প্রসারণ ও কুঞ্চনভেদে স্বরধ্বনিকে প্রসারিত স্বরধ্বনি ও কুঞ্চিত স্বরধ্বনি এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের সংবৃত ও বিবৃতভেদে স্বরধ্বনিকে সংবৃত এবং বিবৃত এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

এছাড়াও অর্ধবিবৃত, অনুনাসিক, দ্বি-স্বরধ্বনি প্রভৃতিভাগে স্বরধ্বনিকে ভাগ করা হয়।

ব্যঞ্জণধ্বনি

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

''যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতিত স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতে পারেনা এবং সাধারনত যে ধ্বনি অন্যধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহাকে ব্যঞ্জণধ্বনি (Consonant Sound) বলে; যেমন— ক্, চ্, ড্, শ্ ইত্যাদি। এইগুলিকে শ্রুতিযোগ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে হইলে স্বরধ্বনির আশ্রয় লইতে হয়। যেমন—ক(ক্+অ), কা(ক্+আ), অক্(অ+ক), কি(ক্+ই), চি(চ্+ই)******ইত্যাদি।''

সুতরাং যে সমস্ত বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে শ্বাসবায়ু মূখবিবরের কোথাও না কোথাও অর্থাৎ জিহ্বা, ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, মূর্ধা প্রভৃতি দ্বারা বাঁধা পায় তাদের ব্যঞ্জণধ্বনি বলে। ব্যঞ্জণধ্বনির রূপ ও সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোন ভাষাতেই সব ব্যঞ্জণ ব্যবহৃত হয় না।

তবে বাংলা বা সংস্কৃত ব্যঞ্জণধ্বনিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটা উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ও অন্যটি উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী।

ব্যঞ্জণধবনিগুলি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরের কণ্ঠ্য, তালু, মূর্ধা, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য প্রভৃতি কোন না কোন স্থানে বাঁধা পেয়ে উচ্চারিত হয়, এজন্য উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জণধ্বনিকে কণ্ঠ্যধ্বনি, তালব্যধ্বনি প্রভৃতিভাগে ভাগ করা হয়।

ব্যঞ্জণধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। কখনো বেশি শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন হয়, কখনো কম শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন হয়, কখনো স্পর্শের ফলে, কখনো ঘর্ষণের ফলে আবার কখনো নাক দিয়ে অথবা কেঁপে কেঁপে উচ্চারিত হয়। এই জন্য উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জণধ্বনিকে স্পৃষ্টধ্বনি, ঘৃষ্টধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি, কম্পনজাত ধ্বনি প্রভৃতিভাগে ভাগ করা হয়।

জিহ্বাশিখরীয় ব্যঞ্জণধ্বনি

ভাষায় ধ্বনি সৃষ্টিতে জিহ্বার ভূমিকা সবচেয়ে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ জিহ্বামূল, জিহ্বাফলক, সম্মুখ জিহ্বা, পশ্চাৎ জিহ্বা নানা ভূমিকা পালন করে। এরফলে ব্যঞ্জণধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়।

যে সব ব্যঞ্জণধ্বনি উচ্চারণ করতে জিহ্বার শিখরভাগ অংশগ্রহণ করে তাদের জিহ্বাশিখরীয় ব্যঞ্জণধ্বনি বলে। মূলত জিহ্বার শিখরভাগ মূর্ধা, দন্ত্য ও দন্ত্যমূল স্পর্শ করে। তাই মূর্ধণ্যধ্বনি, দন্ত্যধ্বনি এবং দন্ত্যমূলীয়ধ্বনিগুলিকে জিহ্বাশিখরীয় ধ্বনি বলে।

মূর্ধণ্যধ্বনি— ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্ -এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বাশিখর মূর্ধা স্পর্শ করে, তাই এগুলি জিহ্বাশিখরীয় ব্যঞ্জণধ্বনি।

দন্ত্যধ্বনি— ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্ -এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বাশিখর দন্ত্য স্পর্শ করে, তাই এগুলিও জিহ্বাশিখরীয় ব্যঞ্জণধ্বনি।

দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি— ন্, ল্ উচ্চারণের সময় জিহ্বারশিখরভাগ দন্ত্যমূল স্পর্শকরে তাই এগুলি জিহ্বাশিখরীয় ব্যঞ্জণধ্বনি।

সম্মুখ ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি

যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের কোথাও বাঁধা পায়না, তাদের স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়— সম্মুখ স্বরধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

সম্মুখ স্বরধ্বনি: ই, এ*, এ', আ— এই চারটি মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সম্মুখদিকে প্রসারিত হয় জন্য এদের সম্মুখ স্বরধ্বনি বলে।

পশ্চাৎ স্বরধ্বনি: আ, অ*, ও, উ— এই চারটি মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট হয় জন্য এদের পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে।

ঘৃষ্টধ্বনি

যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরের কোথাও না কোথাও স্পর্শ করে তাদের স্পৃষ্টধ্বনি বলে। আর যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে কিছুটা শ্বাসবায়ু বের হয় তাদের উষ্মধ্বনি বলে। যদি কোন ধ্বনি উচ্চরণের সময় শ্বাসবায়ুর গতিপথে প্রথমে স্পর্শধ্বনির মত পূর্ণ বাঁধার সৃষ্টি হয়, ক্ষণকাল পরে সেই বাঁধা উষ্মধ্বনির মত আংশিক বাঁধায় পরিণত হয় তবে সেই ধ্বনিকে ঘৃষ্টধ্বনি বলে।

আসলে ঘৃষ্টধ্বনি হল স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির যোগিক রূপ। ঘৃষ্টধ্বনি নানা শ্রেণীর হতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীর যৌগিক উপাদানের মধ্যে দ্বিতীয়টির উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী সেই শ্রেণীর নামকরণ করা হয়— তালু-দন্ত্যমূলীয়, দন্ত্যমূলীয় প্রভৃতি। জিহ্বা ও দন্ত্যমূল এই দুই-এর সাহায্যে ঘৃষ্টধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন- চ, ছ, c, j ।

তরলস্বর

য, র, ল, ব এই বর্ণগুলিকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। অন্তঃ কথাটির অর্থ মাঝামাঝি। এই বর্ণগুলি উচ্চারণের দিক দিয়ে স্বর ও ব্যঞ্জণের মাঝামাঝি অবস্থান করে এবং অবস্থানের দিক দিয়ে স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণরে মাঝামাঝি অবস্থান করে। ইংরেজিতে এদের Semi Vowel, Liquids অর্থাৎ অর্ধস্বর বা তরলস্বর বলে। কারন এদের অন্তর্নিহিত 'অ' ধ্বনি বাদ দিলে পাওয়া যায় ই<য়, ঋ<র, ঌ<ল, উ<ব।

'র' এবং 'ল' এই ব্যঞ্জণদুটিকে বিশেষভাবে তরলস্বর বলা হয়। কারন এই বর্ণদুটি প্রায় স্বরবর্ণের প্রকৃতি ধারণ করে। যদিও 'র' কার উচ্চারণ করতে গেলে জিহ্বা মূর্ধা স্পর্শ করে এবং জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত হয় জন্য 'র'-কার কে কম্পিত ব্যঞ্জণ বলে। আবার 'ল'-কার উচ্চারণে জিহ্বার পার্শ্বদেশ দিয়ে শ্বাসবায়ু বেরোয় জন্য 'ল'-কে পার্শ্বিক ব্যঞ্জণ বলে।

যৌগিক স্বর

একাধিক স্বরধ্বনি পাশাপাশি আবস্থান করে একসঙ্গে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বর বলে। অর্থাৎ একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রযত্নের প্রয়োজন তার মধ্যে দুটি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বর বলে।

বাংলা বর্ণমালায় দু'টি যৌগিক স্বর আছে— ঐ(ও+ই), এবং ঔ(ও+উ)। এছাড়াও আরও অনেক যৌগিক স্বর দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— অয় (ভয়), আয় (খায়), ইয়ে (দিয়ে), আইও (যাইও), আইয়া (পড়াইয়া)।

ঘোষধ্বনি

অনেক সময় আমাদের স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের সঙ্গে আংশিক যুক্ত হয়ে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে আংশিক বাঁধা দেয় এবং শ্বাসবায়ু সেই বাঁধা ঠেলে যাতায়াতের চেষ্টা করে। এরফলে স্বরতন্ত্রী দু'টি কাঁপতে থাকে এবং তাদের কম্পনের ফলে একটি সুর সৃষ্টি হয়। এই সুরকে ঘোষ বা নাদ বলে। যে ধ্বনির সাথে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত এই সুর মিশে থাকে তাকে ঘোষধ্বনি বলে। আর যে ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির কম্পনজাত এই সুর মিশে থাকেনা তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে।

বাংলা বর্ণমালায় প্রতিটি বর্গীয় ধ্বনির তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ— গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, র, ল, হ, ড়, ঢ়, অয়, য়, এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হল ঘোষধ্বনি।

শ্রুতিধ্বনি

অনেক সময় লিখতে গেলে লেখা জড়িয়ে যায়। আবার কথা বলতে গেলে কথাতেও ধ্বনির সাথে ধ্বনি জড়িয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মুখের ভাষায় পদমধ্যস্থিত ধ্বনিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হয়না। জিহ্বা বিশ্রাম না নিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে এক ধ্বনির উচ্চরণ স্থান থেকে অপর ধ্বনির উচ্চারণস্থানে যায়। সুতরাং অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণের সময় এক ধ্বনির উচ্চারণস্থান থেকে অন্যধ্বনির স্থানে যাওয়ার সময় জিহ্বা অসতর্কভাবে মধ্যবর্তীস্থানে অনপেক্ষিত ধ্বনি উচ্চারণ করে। এইরূপ মধ্যবর্তীস্থানে অন্য ধ্বনির আগমনকে শ্রুতিধ্বনি বলে।

যেমন বৈদিক ভাষায় 'সুনর' শব্দের মধ্যে 'দ' এই শ্রুতি ধ্বনি প্রবেশ করে সংস্কৃত ভাষায় 'সুন্দর' হয়েছে। এইরূপ সংস্কৃত 'বানর' থেকে বাংলা 'বান্দর' হয়েছে।

শ্রুতিধ্বনি হিসাবে বাংলায় 'য়' এবং অন্তঃস্থ 'ব' এই দু'টি ধ্বনির অনুপ্রবেশ বেশি ঘটে। ব্যকরণে এই ঘটনাকে 'য়' শ্রুতি এবং 'ব' শ্রুতি বলে। যেমন—
ক)বাং সায়র<প্রা. সাঅর<সং সাগর। য় শ্রুতি।
খ)নাও<নাও<নাব।
গ)বয়ান<বঅন<বচন।
ঘ)শিয়াল<সিআল<শৃগাল ইত্যাদি।

মাত্রাপুরক দীর্ঘীভবন

কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে উচ্চারণের প্রকৃতিও কিছু কিছু বদলে যায়। এরফলে ভাষায় যে সমস্ত ধ্বনি পরিবর্তণ দেখা যায় তার মধ্যে একটি হল স্বরধ্বনির হ্রস্বতা অথবা দীর্ঘতা। ধ্বনি পরিবর্তণের ফলে যুক্ত ব্যঞ্জণধ্বনি একক ব্যঞ্জণধ্বনিতে পরিণত হলেও সে অক্ষরে মাত্রার পরিমান বদলায় না। হ্রস্বস্বরের পর যুক্ত অথবা যুগ্ম ব্যঞ্জণধ্বনি একটি লোপ পেলে স্বাভাবিকভাবে অক্ষরটি একমাত্রিক হবে। আর এইখানে ক্ষতিপুরণের জন্য হ্রস্বস্বরধ্বনিটি দীর্ঘ উচ্চারিত হবে। এভাবে যুক্ত অথবা যুগ্ম ব্যঞ্জণধ্বনি একটিমাত্র ব্যঞ্জণধ্বনিতে পরিণত হলে এবং তারফলে অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারিত হলে তাকে মাত্রাপুরক দীর্ঘীভবন বলে।

অর্থাৎ শব্দের কোন অংশে মাত্রার ন্যুনতা ঘটলে অপর অংশে তার আধিক্য ঘটিয়ে মূল মাত্রা সংখ্যার সমতা আনার একটা প্রবনতা থাকে। এই প্রবনতাকে মাত্রাপুরক দীর্ঘীভবন বলে। যেমন— সাত<সত্ত<সপ্ত; এখানে 'প্ত' যুক্ত ব্যঞ্জণটি 'ত্ত' এই যুগ্ম ব্যঞ্জণে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে একটি 'ত' লোপ পেয়েছে এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিটি (আ<অ) দীর্ঘ উচ্চারিত হয়েছে। এরূপ আরও উদাহরণ—

ভাত<ভত্ত<ভক্ত
মাছ<মচ্ছ<মৎস
কাম<কম্ম<কর্ম।

তালব্যীভবন

জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উচ্চার্য কোন ব্যঞ্জণধ্বনির উচ্চারণকালে যদি জিহ্বার পশ্চাৎভাগ তালু স্পর্শ করে তবে তাকে তালব্যীভবন বলে। অর্থাৎ তালব্যধ্বনিগুলির প্রভ্যবে যদি কোন দন্ত্যধ্বনি বা অন্যধ্বনি তালব্যধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় তবে তাকে তালব্যীভবন বলে।যেমন—

গ্রাজুয়েট<Graduate
এজুকেশন<Education

তালব্যধ্বনির সন্নিধানে অতালব্যধ্বনি তালব্যধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। এই বিচিত্র ব্যাপার দেখে ভাষা বিজ্ঞানী কোলিৎস তার নিয়ম সূত্র বেঁধে দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি মূলভাষার কণ্ঠ্যধ্বনির পরিবর্তণ লক্ষ্য করেই সূত্র করেছিলেন। মূল কণ্ঠ্যধ্বনির পর যদি ই, ঈ, এ থাকে অথবা এমন অ, আ থাকে যা মূলের 'এ' সম্ভূত অথবা অর্ধস্বর 'য়' তবে ঐ কণ্ঠ্যধ্বনি তালব্যধ্বনিতে পরিণত হয়। প্রাকৃত ভাষায় দন্ত্যধ্বনি তালব্য সন্নিধানে তালব্য হয়েছে। যেমন— উজ্জান<উদ্‌জান। এখানে 'য্' এই অর্ধস্বরটি 'জ' এবং 'দ' এই দন্ত্যবর্ণটি 'জ'-এই তালব্য বর্ণে পরিণত হয়েছে। এরূপ আর ও উদাহরণ—
নাচ<নচ্চ<নৃত্য।

অপিনিহিতি

শব্দমধ্যস্থিত ব্যঞ্জণবর্ণে সঙ্গে যুক্ত 'ই' বা 'উ' উচ্চারণের সময় যে ব্যঞ্জণের সঙ্গে যুক্ত তার অব্যবহিত পুর্বেই উচ্চারণ করে ফেলার রীতিকে অপিনিহিতি বলে। যেমন— কইর্‌্যা<করিয়া।

করিয়া= ক্‌+অ+র্‌+ই+য়্‌+আ

কইর্‌্যা= ক্‌+অ+**ই**+র্‌+য়্‌+আ

এখানে 'ই' স্বরধ্বনিটি 'র' ব্যঞ্জণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা 'র' ধ্বনির পূর্বে ই উচ্চারণ করা হয়েছে। এরূপ আরো উদাহরণ—

রাইত<রাতি

সাউধ<সাধু

বাংলায় অপিনিহিতির প্রচলন চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় অপিনিহিতি এখন ও বিদ্যমান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিষ্ট উচ্চারণে এই রীতি হয় লুপ্ত হয়েছে অথবা অভিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অভিশ্রুতি

অপিনিহিতি জাত 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জণের আগে এসে পার্শ্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিবর্তিত হলে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন— করে<কইর‌্যা<করিয়া; এখানে 'করিয়া' শব্দের 'ই' কার অপিনিহিতির ফলে 'কইর‌্যা' শব্দে 'র' ধ্বনির পূর্বেই উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু 'করে' শব্দে পরবর্তী 'অ' ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'এ' কার হয়েছে। এরূপ আরও উদাহরন—

রাত<রাইত<রাতি

সেধো<সাউধ<সাধু।

স্বরসঙ্গতি

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অথবা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দু'টি পৃথক স্বরধ্বনির মধ্যে যদি একটি অন্যটির প্রভাবে বা দু'টিই পরস্পরের প্রভ্যবে প্রভাবিত হয়ে একই রকম স্বরধ্বনিতে বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তবে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন—

পূজো<পূজা

বিলিতি<বিলাতি

দিশি<দেশি

স্বরসঙ্গতি তিন প্রকার। যথা—

১) **প্রগত স্বরসঙ্গতি:** পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি প্রভাবিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন— মুলো<মুলা, মিথ্যে<মিথ্যা, ভিক্ষে<ভিক্ষা, উনুন<উনান।

২)পরাগত স্বরসঙ্গতি: পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি প্রভাবিত হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন— দিশি<দেশি, শোনা<শুনা, লেখা<লিখা।

৩)পারস্পরিক বা অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি: পূর্ববর্তী বা পরবর্তী দুটি স্বরধ্বনিই যদি পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবিত হয় তবে তাকে পারস্পরিক বা অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন— জিলিপি<জিলাপি।

সমীভবন

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত দু'টি বিষম ব্যঞ্জণধ্বনি অর্থাৎ পৃথক ধরণের ব্যঞ্জণধ্বনি যখন একে অপরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে একই রকম ধ্বনিতে বা প্রায় অনুরূপ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে সমীভবন বা ব্যঞ্জণসঙ্গতি বলে। যেমন— পদ্দ<পদ্ম, কম্ম<কর্ম, উল্লাস<উৎ+লাস।
সমীভবন তিন প্রকার—

১)প্রগত সমীভবন: পরবর্তী ব্যঞ্জণধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জণধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন— সত্ত<সত্য; এখানে পূর্ববর্তী 'ত' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'য' ধ্বনি 'ত' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এরূপ আরও উদাহরন— অন্ন<অন্য, চন্দন<চন্নন।

২)পরাগত সমীভবন: পরবর্তী ব্যঞ্জণধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জণধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন—গপ্প<গল্প; এখানে পরবর্তী 'প' ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'ল' ধ্বনি 'প' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এরূপ আরও উদাহরন— কত্তা<কর্তা, ভত্ত<ভক্ত, কম্ম<কর্ম।

৩)পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন: যখন পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দু'টি ব্যঞ্জণধ্বনি পরিবর্তিত হয় তখন তাকে পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন— উচ্ছ্বাস<উৎ+শ্বাস।

ঘোষীভবন

প্রতিটি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি এবং য়, র, ল, ব, ড়, ঢ় এবং সমস্ত স্বরধ্বনিকে ঘোষধ্বনি বলে। এছাড়া অন্য ধ্বনিগুলিকে অঘোষধ্বনি বলে। কোন ঘোষধ্বনির প্রভাবে অঘোষধ্বনি যদি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে ঘোষীভবন বলে। যেমন— কাগ<কাক; এখানে 'ক' অঘোষ ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে 'গ' এই ঘোষ ধ্বনিতে পরিনত হয়েছে, সুতরাং এটি ঘোষীভবনের উদাহরন। এরূপ আরও উদাহরন—

খারাব<খারাপ,
নাজ্জামাই<নাতজামাই।

কিন্তু ঘোষধ্বনির প্রভাব ছাড়া আপনা থেকেই কোন অঘোষ ধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে স্বতঃঘোষীভবন বলে। ঘোষীভবনের ফলে অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তনের উদাহরন ব্যঞ্জণসন্ধিতেও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

দিক্+অন্ত=দিগন্ত
উৎ+ভব=উদ্ভব
উৎ+যম=উদ্যম।

শব্দদ্বৈত

দ্বৈত কথাটির অর্থ দুই। একক শব্দের স্থানে জোড়া শব্দের ব্যবহারকে শব্দদ্বৈত বলে। যেমন— চাকরবাকর, গাছগাছড়া, লেখাজোখা প্রভৃতি।

জোড়া শব্দের শেষ অংশ অনুসারে শব্দদ্বৈতকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

১)অনুকার শব্দ: সমাসের মত দেখতে কোন শব্দের দ্বিতীয়াংশে প্রথম অংশেরই ঈষৎ পরিবর্তিত এবং প্রতিধ্বনির মত হলে তাকে অনুকার শব্দ বলে। যেমন— ভাত-টাত, বই-ফই, চা-টা ইত্যাদি।

২)অনুগামী শব্দ: অনুকার শব্দের মত কোন কোন শব্দ দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বিতীয়াংশের মত ব্যবহৃত হয়। এদের অনুগামী শব্দ বলে। যেমন— রাজারাজরা, ছেলেপিলে, পাখিপাখালি ইত্যাদি।

৩)সমার্থক অনুগামী শব্দ: যদি দ্বিতীয় অংশটির স্বাধীন ব্যবহার থাকে তবে সমার্থক অনুগামী শব্দ বলে। যেমন— গাছপালা, দাবীদাওয়া, ধারেকাছে ইত্যাদি।

বিমিশ্রন

অনেক সময় দেখা যায় কোন একটি শব্দের সাদৃশ্যে এসে অপর কোন শব্দের রূপের পরিবর্তণ ঘটে। বহু শব্দের সাদৃশ্যে না হয়ে যদি একটি মাত্র শব্দের প্রভাবে অপর কোন শব্দের রূপের পরিবর্তণ ঘটে তবে তাকে বিমিশ্রণ বলে। যেমন পর্তূগীজ 'আনানস' (Annanas) শব্দটি বাংলা রস শব্দের সাদৃশ্যে 'আনারস' হয়েছে।

এরূপ ইংরেজি Lemon Juice থেকে লেবেনচুস হয়েছে। অনেক সময় বিমিশ্রনের ফলে ভুল বানানের সৃষ্টি হয়। 'কালীদাস'-এর নজিরে শিক্ষিত লোকের লেখনিতেও অনেক সময় কালীপ্রসন্ন, চন্ডীদাস বের হয়। মনে হয় মামলেট শব্দটি Marmalad ও Omelette এই দু'টি শব্দের মিশ্রনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

ভূয়াশব্দ

অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় লোকনিরুক্তির বশে বা অন্য কারনে এমন নতুন শব্দের সৃষ্টি হয় যার বাস্তবিক কোন মূল্য নেই। এইরকম মূল্যবিহীন শব্দগুলোকেই ভূয়াশব্দ বলে। ভূয়া শব্দগুলি বেশিরভাগ সময় একটি কাল্পনিক মূলধ্বনির সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি যোগ করে গঠন করা হয়। সেই কাল্পনিক মূলটির অস্তিত্ব কোন ভাষাতেই থাকেনা। যেমন— 'প্রোথিত' শব্দটি। সংস্কৃত 'প্রোথ' নামে কোন ধাতু নেই। এটি বাংলা পোতা শব্দের পূর্বরূপ প্রাকৃত শব্দের আদলে কল্পিত। এর সঙ্গে 'ইত' প্রত্যয়টি যোগ করে প্রোথিত হয়েছে।

এরূপ সংস্কৃত 'আহ্বান' শব্দটি থেকে সাধুভাষায় 'আবাহন' শব্দটি এসেছে। আবার সংস্কৃত 'নিরাজন' শব্দটি থেকে 'নিরঞ্জন' শব্দটি এসেছে।

সুভাষণ

সে সমস্ত কারনে শব্দের অর্থের পরিবর্তণ ঘটে তাদের মধ্যে একটি অন্যতম কারন হল সুভাষন। অকল্যানসূচক অথবা নিন্দিত বা কূৎসিত অর্থকে কল্যানবাচক রূপে ভদ্রভাবে প্রকাশ করার জন্য সব ভাষাতে যে রীতি ব্যবহার করা হয় তাকে সুভাষণ বলে। আসলে 'সু' কথাটির অর্থ সুন্দর এবং 'ভাষণ' কথাটির অর্থ বচন বা বলা। সুতরাং সুভাষণ বলতে সুন্দর করে বলাকেই বোঝায়।

যেমন— চাল বা ভাত না থাকাকে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা 'চাল নেই' বা 'ভাত নেই' বলেনা; বলে 'বাড়ন্ত'। আবার মরা বা মারা যাওয়া কথাটিকে সুভাষণ রীতিতে সংস্কৃত ভষায় বলে 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি' এবং বাংলা ভাষায় স্বর্গলাভ বলে। এরকমই ভাত রান্নার রাধুনীকে 'ঠাকুর', অন্ধ ছেলেকে 'পদ্মলোচন', ঝাড়ুদারকে 'জমাদার' বলা হয়।

সাদৃশ্য

অনেকসময় দেখা যায় অর্থসম্বন্ধযুক্ত শব্দ বা পদ সমষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য করবার জন্য কোন শব্দের বা পদের ধ্বনি বা অর্থের পরিবর্তণ ঘটে। একেই বলা হয় সাদৃশ্য। যেমন নাপিতানি, ধোপানি প্রভৃতি ব্যবসাগত স্ত্রীবোধক কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্যে মজুরানি, মাস্টারনি প্রভৃতি শব্দ চলে আসে। আবার সংস্কৃতে আমার

বোঝাতে ‘আম্ভার’ এবং তোমার বোঝাতে ‘তোম্ভার’ শব্দ ব্যবহৃত হয় জন্য এর সাদৃশ্যে সবার বোঝাতে ‘সম্ভার’ ব্যবহার করা হয়।

সাদৃশ্যের কাজ প্রধাণত তিনরকম ১) পদের ধ্বনি পরিবর্তণ, ২) নতুন পদের সৃষ্টি এবং ৩)পদের অর্থ পরিবর্তণ। ভাষার বিবর্তনে সাদৃশ্যের প্রভাব আদিকাল থেকেই চলে এসেছে। সাদৃশ্যের ফলে মানুষ পরস্পর আসংলগ্ন পদসমূহ যথাযথভাবে বাক্যে প্রয়োগ করে ব্যকরণের নিয়মের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে শব্দরূপে এবং ধাতুরূপে ব্যকরণের অনেক জটিলতা দূর হয়েছে। এই সাদৃশ্যের ফলেই ভাষার পরিবর্তণ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তা না হলে কোন ভাষাই দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকত না।

নাসিক্যীভবন

ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এই ধ্বনিগুলিকে নাসিক্যধ্বনি বলে। এই নাসিক্যধ্বনিগুলি অন্য ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তা থেকে লোপ পেয়ে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে তবে তাকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন চাঁদ<চন্দ<চন্দ্র। এখানে ‘ন’ এই নাসিক্যধ্বনিটি যুক্ত অবস্থায় ছিল, কিন্তু নাসিক্যীভবনের ফলে তা লোপ পেয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করে তুলেছে। এরূপ আরও উদাহরন—

পাঁচ<পঞ্চ
শাঁখ<শঙ্খ
বাঁধ<বন্ধ

কিন্তু অনেক সময় নাসিক্য ব্যঞ্জণধ্বনি ছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বরধ্বনি সানুনাসিক হয়। একে স্বতঃনাসিক্যীভবন বলে। যেমন— পেঁচা<পেচক, পুঁথি<পুথি<পুস্তক।

উষ্মীভবন

উচ্চারণের সমর বাগ্যন্ত্রের শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাঁধা পেলে স্পর্শধ্বনি হয়, আর আংশিক বাঁধা পেলে উষ্মধ্বনি হয়। অনেক সময় স্পর্শধ্বনি উচ্চারণ করতে গেলে দেখা যায় শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাঁধা পাচ্ছেনা, আংশিক বাঁধা পাচ্ছে। এরফলে স্পর্শধ্বনি উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় স্পর্শধ্বনি উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় তাকে উষ্মীভবন বলে। যেমন— চট্টগ্রামের বিভাষায় উষ্মীভবনের ব্যপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এখানে কালীপূজা, পায়রা, কাগজ ইত্যাদি শব্দকে খালিফূজা, ফায়রা, খাগজ এর মত উচ্চারণ করা হয়।

উষ্মীভবনের ফলে স্পর্শবর্ণগুলি স, শ বা ইংরেজি `z`মত উচ্চাড়িত হয়। যেমন— পাসে<পাছে, গাস্তলা<গাছতলা।

বিপ্রকর্ষ

বিপ্রকর্ষ শব্দটি ভাঙলে বি-প্রকর্ষ অর্থাৎ বিগত হয়েছে প্রকর্ষ যার অর্থটি পাওয়া যায়। উচ্চরণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জণ ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরধ্বনি আনার প্রবনতাকে বিপ্রকর্ষ বলে। অর্থাৎ বিপ্রকর্ষে যুক্ত ব্যঞ্জণের প্রকর্ষ (আকর্ষণ) বিগত হয়ে তার মাঝে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। বিপ্রকর্ষের অপর নাম স্বরভক্তি বা মধ্যস্বরাগম। যেমন— করম<কর্ম,

কর্ম=ক্+অ+র্+ম্+অ
করম=ক্+অ+র্+**অ**+ম্+অ

উপরের উদাহরনে ‘র’ ও ‘ম’ যুক্ত অবস্থায় ছিল। বিপ্রকর্ষের ফলে এর মাঝে ‘অ’ কারের আগমন ঘটেছে। এরূপ আর ও উদাহরন—

গেরাম<গ্রাম

সিনান<স্নান
শোলক<শ্লোক।

জোড়কলম শব্দ

দু'টি জিনিস কাটা জোড়া করে একটি নতুন জিনিস তৈরি হলে সেই পদ্ধতিকে বলে জোড়কলম। আর এভাবে শব্দ উৎপন্ন হলে তাকে জোড়কলম শব্দ বলে। অর্থাৎ একটি শব্দ বা তার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দ বা তার অংশ বিশেষ যোগ করে যদি একটি নতুন শব্দ তৈরি করা যায় তবে সে শব্দকে জোড়কলম শব্দ বলে। যেমন— আরবি 'মিন্নৎ' শব্দের প্রথম অংশের সঙ্গে সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' শব্দের শেষাংশ যোগ করে জোড়কলমের ফলে নতুন শব্দ 'মিনতি' হয়েছে। এরূপ 'ধোয়া' শব্দের সঙ্গে 'কুয়াশা' যোগ করে হয়েছে 'ধোয়াশা'। আবার Smoke+Fog=Smog.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরকম জোড়কলম করে প্রচুর শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন নিশ্চল+চুপ=নিশ্চুপ, জেদি+তেজালো=জেদালো প্রভৃতি।

লোকনিরুক্তি

অনেক সময় দেখা যায় যে দুরুচার্য ও অপরিচিত শব্দ অল্পবিস্তর ধ্বনিসাম্যের ফলে পরিচিতি শব্দের সাদৃশ্য লাভ করে। এর ফলে শব্দ বিকৃতি দেখা যায়। এই শব্দ বিকৃতিকে লোকনিরুক্তি বলে। আসলে নিরুক্তি মানে বূৎপত্তি বা উৎস নির্ণয়। লোক সাধারন বা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারনের জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে নির্ণিত বূৎপত্তির উপর নির্ভর করে ধ্বনি পরিবর্তণ হয় তাকে লোকনিরুক্তি বলে। যেমন— প্রাচীন বৈদিক ভাষায় মাকড়সার নাম ছিল 'ঊর্ণনাভ' অর্থাৎ যে কীট ওড়না বয়ন করে। পরে 'বভ' ধাতুর বদলে 'নাভ' শব্দটি এসেছে।

এরূপ ইংরেজি Arm Chair শব্দটি বাংলায় আরাম চেয়ার বা আরাম কেদারা হয়েছে। ইংরেজি Hospital শব্দটি ধ্বনি সাম্যের ফলে হাসপাতাল হয়েছে। পুরানে বর্নিত ধনের দেবতা কুবের স্বরসঙ্গতির ফলে কুবের 'কুবির' হয়েছে। এই কুবের নিয়ে শব্দগুচ্ছ হোয়া উচিৎ ছিল টাকার কুবীর। কিন্তু তা না হয়ে লোকনিরুক্তির ফলে টাকার কুমীর হয়েছে।

সমাক্ষর লোপ

কখনো কখনো সমধ্বনি যুক্ত বা সমধ্বনাত্মক অক্ষর পাশাপাশি থাকলে তাদের মধ্যে একটি লোপ পেলে তাকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন— নক্ক্ষত্র এই শব্দটিতে 'ক্' 'ক্ষ' এই সমধন্যাত্মক ধ্বনি দু'টি পাশাপাশি অবস্থান করছিল, কিন্তু 'ক্' ধ্বনিটি লোপ পেয়ে নক্ষত্র হয়েছে।

এরুপ ছোটকাকা সমাক্ষরলোপের ফলে হয়েছে ছোটকা। আবার চাক্+খড়ি সমাক্ষর লোপের ফলে হয়েছে চাখড়ি। পাদোদক শব্দটি সমাক্ষরলোপের ফলে হয়েছে পাদোক।